ব্যান্ডউইডথের দাম না কমানোর খোঁড়া যুক্তি মানা যায় না

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ঘোষণা দিয়ে সরকার চুপ করে বসে আছে এমনটি বলা যাবে না মোটেও। কেননা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু কাজ সরকার করেছে ইতোমধ্যে, যা বাংলাদেশের আগের কোনো সরকারের শাসনামলে দেখা যায়নি, তা সরকারবিরোধী নিন্দুক বা সমালোচকেরাও স্বীকার করবেন আমার দৃঢ়বিশ্বাস। তবে এ কথা ঠিক, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিল তা এদেশের সর্বসাধারণের মনেও ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। আর সরকার সে লক্ষ্য পূরণের জন্য বেশ কিছু কাজ করেছে, আবার কিছু কাজ চলমান অবস্থায় রয়েছে। তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য যে গতিতে কাজগুলো হওয়া উচিত ছিল সে গতিতে এ পর্যন্ত কোনো কাজই হয়নি তা দৃঢ়ভাবে বলা যায়। যেমন কালিয়াকৈরের হাইটেক পার্ক এখনো সম্পন্ন হয়নি, কবে নাগাদ হবে তা কেউই জানে না। ইন্টারনেট খরচ এখনো সবার নাগালের মধ্যে নেই– এ ধরনের আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য অনেকগুলো অনুষঙ্গের মধ্যে অন্যতম একটি হলো ইন্টারনেট। গত সাত-আট বছরে সরকার এক সময়ের ব্যয়বহুল ইন্টারনেটকে সাধারণের নাগালে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের দাম পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনে। গত ৮ বছর আগে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের দাম ছিল প্রতি মেগার জন্য ৭২ হাজার টাকা। ২০০৭ সালে প্রতি মেগা ব্যান্ডউইডথের দাম একবারে ৪২ হাজার টাকা কমিয়ে করা হয় ৩০ হাজার টাকা। পরের বছর ব্যান্ডউইডথের দাম আরো কমিয়ে নির্ধারিত হয় ১৮ হাজার টাকা। ২০০৯ সালে ৬ হাজার টাকা কমিয়ে করা হয় ১২ হাজার টাকা। ২০১১ সালে ব্যান্ডউইডথের দাম কমিয়ে করা হয় ১০ হাজার টাকা। সর্বশেষ ২০১২ সালে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথের দাম কমিয়ে প্রতি মেগার দাম করা হয় মাত্র ৮ হাজার টাকা। গত ৮ বছরে ব্যান্ডউইডথের দাম পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, ব্যান্ডউইডথের দাম মোট ছয়বার কমিয়েছে সরকার। এজন্য সরকারকে ধন্যবাদ দেয়া যায়, যদিও এই দাম এখনো অনেক দেশের তুলনায় বেশি।

ইন্টারনেট ব্যয়বহুল হওয়ায় বাংলাদেশ আইটিইউর রেটিংয়ে এখনো অনেক পেছনে। তাই বর্তমান সরকার ইন্টারনেটের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য গত ৮ বছরে পর্যায়ক্রমে ব্যান্ডউইডথের দাম ৬ বার কমিয়েছে। এর মধ্যে গত ৫ বছরে মেগাবাইটপ্রতি ব্যান্ডউইডথের দাম ১৯ হাজার টাকা কমলেও গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট চার্জ বা ব্যবহার খরচ কমেনি। এর ফলে ইন্টারনেট ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এককভাবে লাভবান হয়। বিগত বছরগুলোতে কোনো ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্যভাবে চার্জ না কমালেও সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) ইন্টারনেট সক্ষমতার দাম কমিয়েছে। এর ফলে ব্যবহারকারীরা বিটিসিএলের উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে, যা এক বড় প্রাপ্তি। এছাড়া আর্থিকভাবে তেমন একটা লাভবান হননি সাধারণ ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেট সেবাদাতাদের গ্রাহক পর্যায়ে দাম না কমানোর জন্য। বিস্ময়করভাবে সরকার ব্যান্ডউইডথের দাম কমালেও সাধারণ গ্রাহকের কোনো উপকার হয়নি।

ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ না কমার পেছনে কাজ করছে এমন ১৬টি কম্পোনেন্ট বা উপাদান চিহ্নিত করে উপাদানগুলোর তালিকা–ব্যাখ্যাসহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পর্যালোচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, শুধু ব্যান্ডউইডথের দাম কমলেই হবে না চিহ্নিত উপাদানগুলো যেমন ইন্টারনেট ট্রানজিট (আইপি ক্লাউড), বিদেশের ডাটা সেন্টারের ভাড়া, দেশী-বিদেশী ব্যাকহোল চার্জ, ল্যান্ডিং স্টেশন ভাড়া, কেন্দ্রীয় সার্ভারের পরিবহন খরচ, গেটওয়ে ভাড়া, আইএসপি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা, এনটিটিএন প্রতিষ্ঠানের আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্ক ভাড়া, ইন্টারনেট যন্ত্রাংশের ওপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ধার্য করা ভ্যাট ও শুল্ক, বিটিআরসির রাজস্ব ভাগাভাগি ইত্যাদি।

ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ না কমার পেছনের উপাদানগুলো চিহ্নিত করে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা হয়তো কিছুটা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু পুরোপুরি মেনে নেয়া যায় না। কেননা নতুন ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার সময় এসব কিছু বিবেচনা করে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার মূল্য ধার্য করে। প্রতি মাসে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে তাদের মুনাফাও বাড়ছে। সরকার গত কয়েক বছরে ব্যান্ডউইডথের দাম ৭২ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ৮ হাজার টাকায় নামিয়ে এনেছে, কিন্তু ইন্টারনেট সেবাদাতারা এক পয়সাও কমায়নি তা রীতিমতো বিস্ময়কার! আবার ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ না কমানোর যে যুক্তি দেখানো হচ্ছে তাও মেনে নেয়া যায় না। আসলে সঠিক নজরদারি না থাকায় এটা সম্ভব হয়েছে। সম্ভবত বাংলাদেশই বিশ্বে একমাত্র দেশ যেখানে এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে। ইন্টারনেট সেবাদানকারীরা শুধু মুনাফাই করবে আর আমরা সাধারণ ব্যবহারকারীরা সবসময় ঠকেই যাব তা হতে পারে না। তাই বিটিসিএল কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের দাবি– ব্যান্ডউইডথের দাম কমলেও ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ কেনো কমছে না তা যথাযথভাবে খতিয়ে দেখা, যাতে কোনো পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

পাভেল
উত্তরা, ঢাকা

ফ্রিল্যান্স প্রশিক্ষণকেন্দ্রের ওপর নজরদারি চাই

সম্প্রতি বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক তরুণ-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিংয়ে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে যেমন কর্মসংস্থান করতে পেরেছে, তেমনি আয় করতে পারছে বিপুল পরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা, যা দেশের রুগ্ন অর্থনীতিতে কিছুটা হলেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারছে। অনেকে পড়াশোনা শেষ করে ফ্রিল্যান্সিংয়ে ক্যারিয়ার বেছে নিয়েছেন। কেননা এটি একটি স্বাধীন পেশা, কোনো বাধাধরার নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হচ্ছে না কাউকে।

সম্প্রতি ফ্রিল্যান্সিংয়ে ক্যারিয়ার গড়ার ইচ্ছে অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে পরিলক্ষিত হতে দেখা যাচ্ছে। তাই তারা ফ্রিল্যান্সিং কী ও ফ্রিল্যান্সিং কিভাবে করতে হয় বা এ কাজে কিভাবে সম্পৃক্ত হওয়া যায় এসব প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন কমপিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ছোটাছুটি করতে শুরু করে দিয়েছে। আর এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বা প্রতারক চক্র গজিয়ে উঠেছে ফ্রিল্যান্সিংয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়ে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টাও করছে, অতীতে যেমনটি হয়েছিল।

সম্প্রতি ফিল্যান্সিং নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় বেশ লেখালেখি হয়। এতে অনেকেই ফ্রিল্যান্সিংয়ে ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন বুঝে বা না বুঝে। যারা ফ্রিল্যান্সি সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হয়ে ক্যারিয়ার গড়তে চাচ্ছেন তাদের অবশ্যই উৎসাহ দেয়া উচিত। কিন্তু যারা ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে কিছুই জানেন না বা বোঝেন না তারা যদি সহজ-সরল মনে কোনো প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ফ্রিল্যান্সিংয়ে প্রশিক্ষণ নিতে যান, তাহলে তাদের প্রতারণার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তারা যাতে প্রতারিত না হন সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোকে এবং সেই সাথে সতর্ক থাকতে হবে অতীতে যেমন ব্যাংঙের ছাতার মতো বিভিন্ন কমপিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল সেভাবে ফ্রিল্যান্সিংকে কেন্দ্র করে প্রশিক্ষণকেন্দ্র সৃষ্টি না হয়। সেই সাথে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করার পাশাপাশি নিয়মিত নজরদারি রাখতে হবে। প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

রহিম ভরসা
ভূতের গলি, ঢাকা

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।